অসমের সাম্প্রতিক বাংলা গল্প : অশান্ত সময়ের দলিল

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

অসমে বসবাসকারী বাঙালিদের চেতনাবিশ্বে যে অভিঘাত এসেছে গত কয়েকটি দশকের জটিল জীবনযাত্রায়, তারই ফসল এখানকার সাম্প্রতিক বাংলা গল্প। দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু জীবন, সাম্প্রদায়িক ও জাতিদাঙ্গা, নানা আন্দোলন এবং বর্তমানের সন্ত্রাস কবলিত গ্রামীণ ও পৌরজীবন এখানকার বাঙালি গল্পকারদের কাছে নানা ব্যঞ্জনায় ধরা দিয়েছে। গল্পগুলোতে একদিকে যেমন আছে অসমে বসবাসকারী বাঙালির অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সমস্যা, তেমনি আছে বিপ্রতীপ পারিপার্শ্বিকে আন্দোলিত গ্রামীণ ও পৌরজীবনের সংকরায়ণ-চিহ্ন। ফলে কখনও কখনও তা হয়ে উঠেছে ডায়াস্পোরিক বাচন। সব মিলিয়ে এই গল্পগুলো এখনকার অশান্ত, অনিশ্চিত সময়েরই প্রতিচ্ছবি।

বর্তমান দশকে যে বাংলা গল্পগুলো এখানে লেখা হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই তার সিংহভাগ গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের আঞ্চলিক-মানবিক ইতিহাসের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। সুতরাং এই গল্পগুলোর অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনকে বুঝতে আমাদের সেই ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা করে নিতে হবে। তাছাড়া আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এখানকার বাঙালি সত্তায় সংকটের প্রেক্ষিতে তৈরি হয়েছে অস্তিত্বহীনতার বোধ থেকে। সেটাই এখানকার বাংলা গল্পের বীজতলি।

এ-কথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে, অসমে ১৮৭২ সালে শিক্ষায় ও সরকারি কাজে বাংলাকে সরিয়ে অসমিয়া ভাষার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অনেক বাঙালি যেমন অসমিয়া ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহমত প্রকাশ করতেন তেমনি অনেকে এর বিরোধিতাও করেছিলেন। যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের অনেকেরই ছিল নিজের ভাষার প্রাগ্রসরতা বোধ ও শাসকের আনুকূল্য লাভজনিত এক উন্নাসিক মনোভাব। ফলে অসমিয়া জনমানসে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল ধীরে-ধীরে এবং ফাটল ধরেছিল অসমিয়া-বাঙালি সম্প্রীতি-সম্পর্কে। এর নানা ছবি ধরা পড়েছে উনিশ ও কুড়ি শতকের নানা লেখায়। বলিনারায়ণ বরা তাঁর সম্পাদিত 'মৌ' পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, বাঙালির পক্ষে অসমিয়াটা শেখা খুবই সহজ, তবুও যে তাঁরা শেখেন না তাতে এটাই বুঝতে হয় যে অসমিয়াদের সঙ্গে সদ্ভাব তৈরির ইচ্ছে তাঁদের নেই। কারণ যতদিন ভাষাটা ভালো করে বলতে পারবেন না ততদিন অসমিয়াদের সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে ওঠা অসম্ভব।[১] ভাষা ছাড়াও অসমিয়া-বাঙালির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের আরও

সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় : অসমের সাম্প্রতিক বাংলা গল্প : অশান্ত সময়ের দলিল
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 166-175

Scanned with OKEN Scanner

একটি দিক হল সাধারণ বা বিশেষ করে অসমিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থ উপার্জন প্রয়াস। ঔপনিবেশিক শাসনপর্ব থেকে আমলা, বাবু ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষের আগমনে অসমিয়া ভদ্রশ্রেণির কর্মক্ষেত্রে স্থান সংকোচনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ফলে খুব জোরালো সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় ও সেকালের অসমিয়া ভদ্রশ্রেণির মনোভাবটি যথাযথ ভাবে তুলে ধরেছেন একালের প্রাজ্ঞ সমালোচক লক্ষ্মীনাথ তামুলি। সময়ের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, 'বাংলা ভাষার আক্রমণের আশঙ্কা তাঁদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে তুলতে প্রেরণা দিয়েছিল। চাকরিতে বাঙালির আধিপত্য শিক্ষিত শ্রেণির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা অনিশ্চিত করে তুলেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির পাকচক্রে পড়ে চাকরির সংকট বা বাংলাভাষার আগ্রাসী আক্রমণের চরিত্র তাঁরা বুঝতে পারেননি। উপরন্তু এই পরিস্থিতিতে বাঙালি স্বাজাত্যাভিমান নির্দিষ্টভাবে অসমিয়াদের আলাদা অস্তিত্ব শুধু জিইয়ে রাখাই নয়, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী করতেও প্রেরণা দিল।'[২] এই মন্তব্যকে একটি বিরোধের সূচনা ও তার বিস্তারের যথার্থ বিশ্লেষণ বলে আমরা মনে করি। নিবন্ধের শুরুতে আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা এতদঞ্চলে বাঙালি বিরোধী যে আন্দোলনগুলোর কথা বলেছি তার পূর্বসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে শ্রী তামুলির এই মন্তব্যে। এখানকার বাঙালির সংকটের কারণ ও কীভাবে তা ঘনীভূত হল সেটাও এই বিশ্লেষণ থেকে আন্দাজ করে নেওয়া কঠিন নয়।

তবে এখানে বাঙালিদের টানাপোড়েনকে নিয়ে যত বাংলা গল্প লেখা হয়েছে তাতে এই সংকট গড়ে ওঠার ইতিহাস নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হয়নি। নিজেদের দুঃখ—বঞ্চনাকে গল্পকারেরা এতটা বড় করে দেখেছেন যে তাঁদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলেও তা বুঝতে পারেননি। সেজন্য ইতিহাসের একটা দিকই তাঁদের লেখায় জায়গা করে নিয়েছে। নিজেদের জীবনের ওপর যে সংকটের ছায়া ঘনীভূত হয়েছে তাকে নিয়ে গল্পকারেরা ব্যস্ত থেকেছেন। বাঙালির স্বাজাত্যাভিমান যত প্রলম্বিত হয়েছে তত প্রতিরোধের নিত্য নতুন অবলম্বনকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছেন। গল্পকারেরাও পরিস্থিতির প্রভাবকে কাটাতে পারেননি। তাই তাঁদের প্রতিবেদন অনেক সময় একদেশদর্শিতায় আচ্ছন্ন। তবে আশির দশক-পরবর্তী সময় এখানকার কথাসাহিত্য সৃষ্টির নতুন নিরিখ তৈরি করে দিয়েছে। অসমিয়া-বাঙালি শুধু নয়, এতদঞ্চলের সার্বিক জীবনধারাই সংকটকালের নতুন নিরীক্ষায় এখানকার বাংলা গল্পে স্থান পাচ্ছে। সম্পর্কের নতুন বয়ানে এই গল্পগুলো উজ্জীবিত হচ্ছে। এভাবেই সময়ের অমোঘ আহ্বানে রচিত হচ্ছে নতুন ইতিহাস, যাকে আমরা বলেছি 'অশান্ত সময়ের দলিল'।

অশান্ত সময়ের ছবি নির্মাণে গল্পকারেরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকটি 'মোটিফ' ব্যবহার করেছেন। সেগুলো হচ্ছে সন্ত্রাস বা উগ্রবাদ, বিভেদের রাজনীতি, আত্মপরিচয় ও অস্তিত্বের সংকট এবং সমবায়ী চেতনা। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গল্প লেখা হয়েছে সন্ত্রাসকে নিয়ে। শেষেরটি আবার বয়নবৈচিত্র্য এবং ডায়াস্পোরিক চিন্তাসূত্রে ঋদ্ধ। পরিসংখ্যানের দিক থেকে এই 'মোটিফ'গুলোকে নিয়ে লেখা গল্পের লেখচিত্রটা হবে এরকম,

Scanned with OKEN Scanner

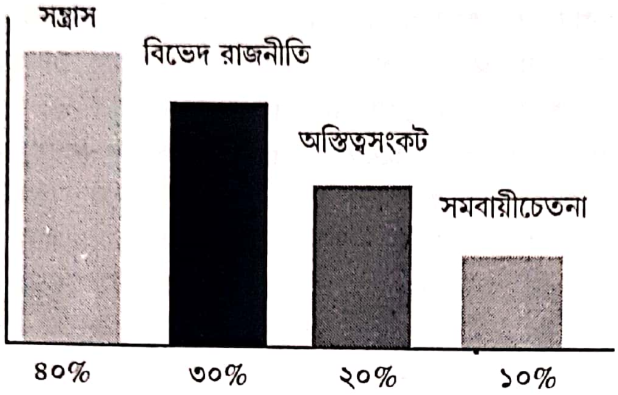

(২০০০ সাল থেকে ২০১০ এর জানুয়ারি পর্যন্ত রচিত গল্পের আনুমানিক পরিসংখ্যান)

বিভিন্ন 'মোটিফ'-এর গল্পগুলোতে আবার বিষয়ভেদ এসেছে রাষ্ট্রীয়সন্ত্রাস, বৈরিসন্ত্রাস, জাতিদাঙ্গা, নিহিত স্বার্থপ্রসূত বিরোধ, সরকারি বঞ্চনা, উদ্বাস্তু বা বিদেশি সমস্যা, বাঙালির নিরালম্ব অবস্থান, ডায়াস্পোরিক চিন্তাসূত্র ইত্যাদিকে অবলম্বন করে। অবশ্য এই বিষয় বা 'মোটিফ'গুলোর মধ্যে কোনো জলবিভাজন রেখা নেই। গল্পকারেরা যেমন বিভিন্ন 'মোটিফ' নিয়ে গল্প লিখেছেন, তেমনি কখনও একই গল্পে একাধিক 'মোটিফ' স্থান পেয়েছে।

সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ—এই দুটি শব্দ অসমের আকাশে বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে, আঘাত আর প্রত্যাঘাতের ক্রমান্বয় শোণিতলীলায় জনজীবনকে মথিত করেছে। আসলে আধিপত্যকামী স্বার্থবাহ যূথচিন্তামুদ্রার একপিঠে আছে সন্ত্রাস আর অন্য পিঠে উগ্রবাদ। এই যে অশান্ত সামাজিক পরিবেশ, তার আভ্যন্তরীণ ও বহির্মুখী টানাপোড়েন স্পষ্টতই ধরা পড়েছে এই গল্পগুলোতে। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলোর মধ্যে আছে দীপঙ্কর করের 'হুমকির পর যা ঘটে' (একা এবং কয়েকজন, ২০০০), তপন মহন্তর 'ছায়াদীঘল পট' (দিক ও দিগর, ২০০১) এবং 'বিপন্ন প্রজাতি' (সপ্তবার্তা, ২০০৭), দেবীপ্রসাদ সিংহর 'সীমানার ওপর থমকে থাকা পা' (গল্পবিশ্ব, ২০০২), মিথিলেশ ভট্টাচার্য্যর 'রক্তমাতাল' (সাহিত্য ৮২, ২০০৪), ঝুমুর পাণ্ডের 'সনারামের বউ' (লালনমঞ্চ, ২০০৫), অভিজিৎ চক্রবর্তীর 'অপারেশন অ্যান্টিসোশ্যাল' (একা এবং কয়েকজন, ২০০৬), শেখর দাশের 'লস্ট হরাইজন' (নবপর্যায় সম্ভার, ২০০৭), হিমাশিস ভট্টাচার্য্যর 'মুক্তিপণ' (সাহিত্য ১০০, ২০০৮), এবং 'অপহরণ' (সাহিত্য ১০৬, ২০১০), বিজয়া দেবের 'ছায়াপথ' ('বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার', সম্পা. বিকাশ রায় ও অমিতাভ দেব চৌধুরী, উবুদশ প্রকাশ, ২০০৮), দেবযানী ভট্টাচার্য্যর 'ক্ষণিকের শীতল স্পর্শ' (সংলাপ ৯-১০ম, ২০০৮), পুলকেন্দু চক্রবর্তীর 'বোমা' (মুখাবয়বঃ অসীমান্তিক বাংলা গল্প-১, সংখ্যা ২৫-২৬, ২০০৯) ইত্যাদি।

দেবযানীর গল্পটিতে আছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ছবি। প্রণবেশ ও মানসীর একমাত্র সন্তান বুবুনকে উগ্ররা তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

Scanned with OKEN Scanner

বহু বছর পর বুবুনের বয়সী এক আদিবাসী জঙ্গি আশ্রয় নেয় তাঁদের বাড়িতে। তার পেছনে আসে পুলিশ। লেখিকার বয়ানেই দেখা যাক সন্ত্রাসের এই চলচ্চিত্রকে, —"হুড়মুড় করে ঢুকল ত্রস্ত পুলিশ বাহিনী। ঘরে ঢুকেই তছনছ শুরু করে দিল। না। কোনো সার্চ ওয়ারেন্ট দেখাল না...দরজা ভেঙে, ভেতর থেকে টেনে-হিঁচড়ে ছেলেটাকে নিয়ে গেল ওরা। ... বাইরে গুলির আওয়াজ, পরপর দুটো। ... ছেলেটাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চারজন পুলিশ গাড়িতে ঢুকল।" এর আগেই পাঠক জেনে গেছেন যে ছেলেটাকে গুলি করা হয়েছিল পেছন থেকে। ভুয়ো এনকাউন্টারের এই ছবি আমাদের সন্ত্রাস কবলিত জীবনে একটি সত্য অভিযোগ, যাকে লেখিকা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর বয়ানে।

অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি উগ্রসমস্যা কেন্দ্রিক বিষয়গুলো এখানকার গল্পের বয়ানে চলে এসেছে। হিমাশিস, শেখর, মিথিলেশ, ঝুমুর, তপন, দীপঙ্কর এঁদের প্রত্যেকের গল্পেই কম-বেশি ব্যাপারটির বর্ণনা ও তাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে শেখর ও ঝুমুরের গল্পে এর মানবিক দিকটি বড় হয়ে উঠেছে।

'লস্ট হরাইজন' গল্পে একটি চা-বাগানের ম্যানেজার ঋষভ কাপুর অপহৃত হন এবং কোম্পানি বৈরিদের প্রত্যাশা অনুযায়ী মুক্তিপণ না দেওয়ায় উগ্রবাদীদের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। সুদূর থাইল্যান্ড থেকে কোম্পানির বড়কর্তারা যোগাযোগ রাখছিলেন রিপন চলিহার মাধ্যমে। কেননা তাঁকেই কোম্পানি দায়িত্ব দিয়েছিল মধ্যস্থতা করার জন্য। কিন্তু ব্যর্থ চলিহা শিলঙের হোটেলে নিরাপদ দূরত্বে মফলঙ পানে ডুবে থাকেন। বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তায় ধরা পড়ে সাম্প্রতিক অশান্ত অসম তথা গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছবি। যেমন,—'মেঘালয়ে হরতাল মানে বরাকভ্যালি ত্রিপুরা মিজোরামে মজুতদারের জোর করতাল। ...কত জনদরদী বৈশ্যকুল নেতা—প্রশাসন সহযোগ। নিবিড় কনফেডারেসি।' এই অশান্ত সময়েই শ্রান্তিবিহীন 'মনগড়ন' কিছু গুজব তৈরি হয়। যেমন আলফার নাম নিয়ে 'রেজিমেন্টের রাইফেল' মেরে দিল কয়েকজনকে, 'রেপ' করে দুজন 'ছোআলিকে' (অসমিয়া মেয়ে)। চলিহার মতো লোকেদের কাছে গুজবের উত্তেজনাগুলো চাপা পড়ে মফলঙ-রাম ও 'কনি'-র (ডিম) যুগলবন্দীতে। এই প্রেক্ষাপটেই মর্মান্তিক হয়ে ওঠে ঋষভের একমাত্র মেয়ে তিন্নির কান্না,—"তুমি ফিরে এস। মেরা একজাম শুরু হোনে কো হ্যায় ... তুম চলে আও জলদি, মেরে পাপা।" প্রকৃতপক্ষে এই হাহাকারই যে সন্ত্রাসের নিটফল তা গল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

ঝুমুরের গল্পে চা-বাগানের ম্যানেজার বরদাবাবুর অপহরণের তদন্ত হয় অথচ শ্রমিক সনারামের কথা কেউ বলে না। তার মুক্তির জন্য রিয়াঙ্ জঙ্গিদের নাকি চাই পঁচিশ হাজার টাকা। সেটা তো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই তার অসহায় বউ, যে জঙ্গলকে ভালহেসে একদিন চা-বাগানে এসেছিল, সেখানেই স্বামীকে খুঁজতে থাকে। লেখিকা সনারামের বউয়ের দুঃখকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে পাঠক সহজেই বোঝেন যে সনারামেরা ফেরে না। তাদের কথা চাপা পড়ে যায়।

দেবীপ্রসাদের গল্পে আছে গুয়াহাটি শহরের দুটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা-প্রেক্ষিত। গল্পকার বিস্ফোরণ পরবর্তী রাজনীতির দিকে তীব্র ব্যঙ্গবাণ ছুঁড়েছেন,

আর তাতেই সময়ের ছবিটা স্পষ্ট হয়। নাইটসুপারে বিস্ফোরণ হয়, পুলিশ যাত্রীদের কোনো সহায়তা করে না, অ্যাম্বুলেন্স রাস্তায় খারাপ হয়ে পড়ে থাকে, মন্ত্রীরা সবকিছুর দায় চাপান আই. এস. আই নামক জুজুর ঘাড়ে। তদন্ত চলে, কিন্তু কোনো সত্য ধরা পড়ে না, তদন্ত একসময় বন্ধ হয়। স্থিতাবস্থা বজায় রেখে সবকিছু আবার আগের মতো চলতে থাকে। কেননা, 'দশজন মৃত মানুষ বা বিস্ফোরণের একটি ঘটনা, কিছুই নয় শেষ পর্যন্ত, ইতিহাসের ফুটনোট হবারও যোগ্য নয়...'।

সন্ত্রাস রাজনীতির আর একটি দিকের সন্ধান দিয়েছেন তপন মহন্ত। লক্ষ্মীমপুরের শিল্পী দেবেন ওরফে দেবুকে আলফার গতিবিধি জানার জন্য সেনার লোকেরা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় ও অমানুষিক অত্যাচার করে। পরে বাড়ি ফিরে দেবু জানতে পারে যে, তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু কমল প্রাইমারি স্কুলের চাকরিটা পাবার জন্য তাকে মিথ্যে আলফা সাজিয়েছিল। এতে যে মানবিকতার স্খলন বা নির্মানবায়ণের ছবি ফুটেছে সেটাও এই অশান্ত সময়েরই ভাষ্য।

উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসদীর্ণ শহরজীবনের একেবারে আধুনিক ছবি এঁকেছেন অভিজিৎ চক্রবর্তী। ১৪ ও ১৫ আগস্ট যেখানে ভারতের সবাই স্বাধীনতা দিবস পালন করেন সেখানে এখানকার মানুষকে 'বন্ধ'-এর জন্য ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হয়। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই গল্পকার সময়ের চাহিদার কথা সজোরে ঘোষণা করেন। বোমাতঙ্কের জেরে বিদ্যুৎ-সংযোগহীন গ্রিনভ্যালি আবাসনের বাঙালি, অসমিয়া, মাড়োয়ারি, বিহারি—সবাই বন্দী। কিন্তু এক এক করে সবাই আবাসনের ছাদে ভিড় করেন, সবার সঙ্গে পরিচয় হয়, এমনকী ঘটা করে বৃদ্ধা কাননবালা দেবীর একশোতম জন্মদিনও পালিত হয়। বিদ্যুৎ এলে সবাই আবার নিজেদের কোটরে ঢুকে পড়েন। কিন্তু বাচ্চারা বিচ্ছিন্নতা ভুলে একজোট হল খেলার সরঞ্জাম নিয়ে। নির্মাণবায়ণের যুগে বিচ্ছিন্নতা ভোলাই হল কাঙ্ক্ষিত সময়চেতনা।

ভেদরাজনীতিকে কেন্দ্র করে যে-সব গল্প লেখা হয়েছে, এবারে তাদের কথা বলা যেতে পারে। আমাদের তালিকায় থাকবে দীপঙ্কর করের 'উদ্ধার কাহিনী' (পূর্বদেশ গল্পপত্র, ২০০১), বিকাশ রায়ের 'আজকের ইহুদী' (দিক ও দিগর, ২০০১), অভিজিৎ চক্রবর্তীর 'সংবাদ সহবাসে সুমনের একদিন' (দিক ও দিগর, ২০০৩), ধীরাজ চক্রবর্তীর 'মনসুর মিঞাকে সমর্থন করবেন না' (একা এবং কয়েকজন, ২০০৫), শঙ্করজ্যোতি দেবের 'রুগ্ন তাঁতকলের শব্দ' (সাহিত্য ৯২, ২০০৬), ঝুমুর পাণ্ডের 'কৃষ্ণমণি হাঁটে' ('দাঙ্গার গল্প', সম্পা. বিজিত ঘোষ, পুনশ্চ, ২০০৯), পরিতোষ তালুকদারের 'জননী' ('শরীরী উপত্যকা', গল্পগ্রন্থ, ২০০৯) এবং অর্জুন দাসের 'আমি, সে ও তারা' (সংলাপ, ৫৩-৫৪ সংখ্যা, ২০০৯)। জাতিদাঙ্গা, বিদেশি বিতারণকে হাতিয়ার করে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা, সরকারের উন্নয়নমূলক প্রয়াসের আসল চেহারা, রাজনীতির কৃৎকৌশল ইত্যাদিকে আশ্রয় করে জীবনের নানা কূট অভিজ্ঞতা লেখকেরা এইসব গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দীপঙ্কর তাঁর গল্পে দেখেন কীভাবে একটি খুনকে কেন্দ্র করে দুটি পাশাপাশি গ্রামের মানুষের মধ্যে বিরোধের আবহ তৈরি হয়। মরাখালির দুপাশে দুটি গ্রাম—একটিতে থাকে 'প্লেন ট্রাইবাল' জনগোষ্ঠীর লোক আর অন্যটিতে 'লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি'র

Scanned with OKEN Scanner

আধিপত্য। দাঙ্গা বাঁধানোর উদ্দেশ্যে কেউ বা কারা একটি ট্রাইবাল ছেলেকে মেরে মরাখালিতে ফেলে রেখে যায়। তারপরই শুরু হয় টেনশন। লেখকের বর্ণনায় আছে, — "... আইছে আইছে, ... রাইজ হুশিয়ার তার নাম না জানু কেলা; এসব কাটা কাটা বাক্যসহ চিৎকার, লাঠি-বর্শার আস্ফালন ... লণ্ঠনের অবশ আলোয় গোটা গ্রামই তখন কাঁপতে থাকে উত্তেজনায়...।"

বিকাশ রায়ের গল্পটা গড়ে উঠেছে বোড়ো-সাঁওতাল সংঘর্ষের পটভূমিকায়। একে অপরের বাড়ি-ঘর-ফসল পুড়িয়ে দেওয়ায় বোড়ো ছেলে সিগাং আর সাঁওতাল ছেলে গংগুকে পরিজনদের কাছ থেকে ছিটকে যেতে হয়। কয়েকদিন জঙ্গলে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াবার পর দুজনেই আশ্রয় শিবিরে জায়গা পায়। তবে এখানেও দেখা যায় যে তারা আলাদা আলাদা শিবিরে আশ্রয় পাচ্ছে।

শঙ্করজ্যোতি দেখান কীভাবে একজন সরকারি আধিকারিক জনসাধারণের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করতে এসেও মনে বিভেদের ভাব পুষে রাখেন। প্রবীণ দাস নিজের বাড়ি থেকে তিনশো কিলোমিটার দূরে সমাজ কল্যাণ দপ্তরে কাজ করতে এসে ঘুষের বিনিময়ে চাকরি দেন। যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করেন। তাঁর একথা বলতে দ্বিধা হয় না যে তিনি টাকার জন্যই 'কালাপানি'তে এসেছেন।

ধীরাজের গল্পটির মুখ্য চরিত্র ব্রহ্মপুত্রের চরবাসী এবং মূলত ছিন্নমূল মনসুর মিঞা। মনসুর এই দেশে এসে বিঘা দুয়েক জমি কব্জা করে নেয়। অপর ছিন্নমূল সাব্বির আলির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। চোরাচালানের কাজে সে কিন্তু সাব্বিরকে সাহায্য করতে রাজি হয় না। ফলে পুলিশের সঙ্গে আঁতাত করে সাব্বির তাকে বিদেশি বলে ধরিয়ে দেয়। মনসুরকে তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় চাষের জমি, তার নিজের হাতে ফলানো পুত্রসম ফুলকপি হাসানকে ছেড়ে ফিরে যেতে হয় স্বদেশে। একান্ত স্বার্থচিন্তা এখানে বিদেশি বিতারণের অস্ত্রে ভেদ রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে, আর সেটাই গল্পকার দেখালেন তাঁর এই গল্পটিতে।

গুয়াহাটি শহরে আদিবাসীদের মিছিলকে কেন্দ্র করে যে লজ্জাজনক ঘটনাটি ঘটেছিল সেটাই পরিতোষ তালুকদারের গল্পটির প্রেক্ষাপট। তাড়া খাওয়া আদিবাসী মেয়ে লুদগিকে আশ্রয় দেন জীবনবাবু। পরে অবস্থা স্বাভাবিক হলে হাতে কিছু টাকা দিয়ে মেয়েটিকে তিনি ফেরার বাসে তুলে দেন। এই গল্পে লেখক ঘটনার বিশ্লেষণে না গিয়ে নারকীয় তাণ্ডবের দৃশ্য বর্ণনা করেন। এই গল্পও কিন্তু নির্মানবায়ণের অন্যতম চিহ্ন এবং একান্তভাবেই সময়ের ছবি।

আমরা বলেছিলাম যে এখানকার বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট বা অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের বোধ একটি অন্যতম সমস্যা, যেটা নিয়ে গল্পকারেরা বহু সময় আন্দোলিত হয়েছেন। সংকটকালের চিত্রায়নে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে সমবায়ী চেতনা। এদিক থেকে দেখতে গেলে মোটিফ দুটো হলেও আসলে তার উৎস একটিই। পরবাসে অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের বোধ সময়ের পরিবর্তনে সংকরায়ণ প্রক্রিয়াকে উৎসাহ দিয়েছে, সমন্বয়ের বোধ এনে দিয়েছে আর ডায়াস্পোরিক চিন্তাসূত্রে বাঁধতে চেয়েছে গল্পের পাঠককে।

বর্তমান দশকে লেখা এ-ধরনের কয়েকটি গল্প হল—দেবীপ্রসাদ সিংহর 'অনন্তের

Scanned with OKEN Scanner

শেষ ছেলেবেলা' (পূর্বদেশ গল্পপত্র, ২০০২) এবং 'বাসাবদল' (একা এবং কয়েকজন, ২০০৮), দীপঙ্কর করের 'শত্রু শত্রু খেলা' ('খোলসকথা', গল্পগ্রন্থ, ২০০২), অভিজিৎ চক্রবর্তীর 'সন্তোষ বিশ্বাসের গল্প' (সাগ্নিক, ২০০৫), পুলকেন্দু চক্রবর্তীর 'জাগরণ' (পরম্পরা, ২০০৭), অরিজিৎ চক্রবর্তীর 'নিরালম্ব' (সাহিত্য ১০০, ২০০৮), জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তর 'প্রাচীরকথা' (পরম্পরা, ২০০৮), পরিতোষ তালুকদারের 'শিকড়' ('শরীরী উপত্যকা', ২০০৯), তুষারকান্তি সাহার 'শ্রীবাস মণ্ডলের দাবিদাওয়া' (ব্যতিক্রম, সেপ্টেম্বর ২০০৯), নারায়ণ চন্দ্র সরকারের 'ম্যাজেন্টা রঙের মেখলা' ('নির্বাচিত গল্প', ২০০৯), তীর্থঙ্কর চন্দর 'অপরাজিত' (সাহিত্য ১০৬, ২০১০) এবং কুমার অজিত দত্তর 'প্রবাসে' (মুখাবয়ব, বাহির বাংলার গল্প-১)।

দেবীপ্রসাদ তাঁর সৃষ্ট অনন্ত চরিত্রটির ছোটবেলার যাপনচিত্রকে কেন্দ্রে রেখে উল্লিখিত দুটি গল্প লিখেছেন। এই দুটো গল্পেই লেখক ধরতে চেয়েছেন অসমিয়া-বাঙালি বিরোধের ছবি, বাঙালির টেনশন, পরবাসে বাঙালির অস্তিত্বভাবনাকে। তিনি সেই সময়টাকে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন যখন বাঙালির আত্মপরিচয় ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে এবং নতুন অভিজ্ঞান তৈরি হচ্ছে 'খারখোয়া', 'কেলা বঙাল' ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে পরিচয়ে। প্রথম গল্পে লেখক অনন্তর বোধচিত্রকে তুলে ধরেন এভাবে,—"অনন্তের ইনস্টিংক্ট এই আর্তি টের পেত, কিন্তু বালক অনন্ত যেটা কখনও বুঝত না সেটা হল, নিজের মাটি, নিজের বাড়ির জন্যে মানুষ, বিশেষ করে অনিমেষ অনুভার মতো 'রিফিউজি' মানুষেরা হাহাকার করে কেন?" এরপর অনন্ত মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে অসমিয়া ছেলেদের হাতে মার খায়। তার বাঙালি বন্ধুরা কেউ তাকে বাঁচাতে আসে না। বরং বলে,—"অসমিয়াদের গায়ে হাত তুললে আমাদের আর এখানে থাকতে হবে না।" পরের গল্পে আমরা দেখি অনন্তরা বাড়ি বদলে মালিগাঁওতে গেলে ওখানে পালবাবু জানান যে মালিগাঁও খুব ভালো পাড়া। মুখার্জিসাহেবও স্বস্তি প্রকাশ করেন,—"এ-পাড়ায় সব আমাদের মতো কালচার্ড লোক। একজনও এস. সি এস. টি নেই। মুসলমান নেই। অসমিয়া নেই।" অথচ বাস্তবকে অস্বীকার করেও তো কোনো লাভ নেই। সেকথাও অনন্তর বাবা অনিমেষ বোঝেন,—"এটা ওদের জায়গা, আমরা পাকিস্তান থেকে তাড়ানো রিফিউজি।"

এভাবে অভিজিৎ চক্রবর্তীর গল্পটিও উদ্বাস্তু সংকটের বিশ্বাসযোগ্য দলিল হয়ে উঠেছে। 'ইন্ডিয়ার মাটি' খুব দরকার হয়ে পড়ায় অনেকের মতো সন্তোষ বিশ্বাসও একবার ৫২ সালে আর তারপর পাকাপাকি ভাবে ৫৭ সালে ভারতে অর্থাৎ অসমে চলে আসেন। 'তারপর থেকে তাঁর ঢেউয়ের মাথায় জীবন'। ১৯৬০ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে ২০০৩ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, জাতিদাঙ্গা ইত্যাদি নানা কারণে তাঁদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ফলে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অমোঘ প্রশ্ন,—"কে আমি? কার আমি? ... আমি বাঙালির কেউ হতে পারলাম না, অসমিয়ার কেউ হতে পারলাম না, বোড়োদেরও কেউ হতে পারব না জানি।" এই বেদনা, এই অস্তিত্ব সংকট এখানকার বাঙালির এ-সময়ের ছবি।

এই প্রেক্ষাপটেই পড়ে নিতে হয় অরিজিৎ চৌধুরীর 'নিরালম্ব'। বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিক সৌম্য বৈধভাবে অসমের করিমগঞ্জে আসে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে।

উদ্দেশ্য সে দেশের গুমোট পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য এখানে একটু আস্তানার ব্যবস্থা করা। সে যখন ফিরে যায় তখন তার বাংলাদেশী বন্ধু নাজির তাকে বলে যে আর বছর পনেরো অপেক্ষা করলেই তার ভারতে যাবার দরকার পড়বে না কারণ, "দেখবে ভাঙা ইন্ডিয়া জোড়া লাগছে, আর রুল কররাম আমরাউ।" সৌম্য যেমন বোঝে না যে এটা ব্যঙ্গ না সত্য, তেমনি পাঠকও বিহ্বল হয়ে পড়েন গল্পের এই পরিণামী উক্তিতে। তবে এখানে স্বপ্ন-সত্য, সম্ভব-অসম্ভব, ঘটনা-রটনা ইত্যাদি মিলেমিশে বর্তমান অস্থির সময়ের বয়ানই রচিত হয়েছে।

তীর্থঙ্করের গল্পে দেখা যায় চরম অস্তিত্ব সংকটের ছবি। দেশভাগের শিকার ও একসময়ের উদ্বাস্তুরা আজ সমগোত্রীয় স্বর্ণলতাদের দেখে বলেন,—'ইণ্ডলান বাংলাদেশী'। আর স্বর্ণলতা ভাবেন,—"ওই বর্ডার থেকে বদরপুর! বেদে তাড়ানো পাখির মতো কে যেন ওঁকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" সেজন্যই থিতু হয়ে বসাটাও তাঁকে স্বস্তি দেয় না।

কুমার অজিত দত্তের গল্পেও সেই একই যন্ত্রণার ছবি। এখানে অনাদি-দুলালিরা 'আতঙ্কে, ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়চ্ছে সেই ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ থেকে আসাম, হাজারিবাগ তারপর এই মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারি।' এই সবই উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে থিতু হবার আপ্রাণ চেষ্টার যন্ত্রণাময় ছবি। নিজস্ব কোনো ভূগোল তৈরি হয় না বলেই নিরন্তর পালিয়ে বেড়াতে হয় এঁদের। আর যাঁরা এভাবে পালাতেপারেন না তাঁরা বানিয়ে নেন বেঁচে থাকার জন্য নিজস্ব পরিসর। বর্তমানে আলোচকের 'প্রাচীরকথা'য় আছে এই পরিসর তৈরির কথা। টিকেন রাভা পথের স্থায়ী বাসিন্দা অমরেশ এক চক্রান্তের মুখোমুখি হয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়ি তৈরির মিস্ত্রি বাবলুকে বলেন, —"যতটা সম্ভব ভেতরের দিকে টেনে একটা পাঁচিল তৈরি কর, যাতে ভেঙে পড়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে।" অমরেশ ইনার ডায়াস্পোরিক বাঙালি, 'আমরা বাঙালি' মার্কা কোনো দার্শনিক বিশুদ্ধতার আড়াল তিনি গড়ে তোলেননি। এক বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তাঁর মধ্যে কুঠুরিসত্তা (compartmentalism) জন্ম নিয়েছে। এটাও বর্তমান অশান্ত অসম সে এক নতুন সম্ভাবনার ছবি।

প্রসঙ্গত বলি, এখানকার বাঙালিরা তো বটেই এমনকী গল্পকারেরাও মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্য যে ভাষার (বিশেষভাবে অসমিয়া ভাষার) সংস্পর্শে আসছেন তাকে এবং তার মানুষজনদের নিয়েই গড়ে তুলছেন ডায়াস্পোরিক পাঠবস্তু। ব্যক্তির অসুখের চেয়ে সার্বিকভাবে সমাজের অসুখটাই গল্পকারদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। ডায়াস্পোরিক চারিত্রের জন্যই তাঁরা শিকড়হীনতার বোধ থেকে বাইরে বেরোতে পারেননি। অন্তত কয়েকটি গল্পে আমরা এর পরিচয় পাব। তুষারকান্তি সাহার 'শ্রীবাস মণ্ডলের দাবিদাওয়া' গল্পের শ্রীবাস একজন উদ্বাস্তু ও ভিখিরি। শহরের বোমা বিস্ফোরণে সে এক পা হারিয়েছে। তবু বেঁচে থাকার তাগিদেই তার ভেতর জন্ম নেয় বলিষ্ঠ প্রত্যয়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে তার রোজকার বোঝাপড়া, মিলেমিশে যাওয়া। তাই তার উক্তিতে থাকে সংকরায়ণের চিহ্ন,—

১) আমার ডাইন <u>ভরিটা</u> ফিরাইয়া দ্যান, মাগন ছাইড়া দিমু।

২) আমি এমন কী <u>বেয়া</u> কথা কইছি কন।

৩) আমরা লুইতের জলে তো ভাইস্যা আইসি না।

আমরা এখানে সহজেই খুঁজে পাই অসমিয়া এবং বাংলা ঔপভাষিক গদ্যরীতির মিশ্রণ আর অসমিয়া শব্দের (নিম্নরেখ) সাবলীল ব্যবহার। পরিতোষের শিকড় হারানো রশিদুল রিক্সাওয়ালার অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ। সময়ের প্রয়োজনেই সে বাংলা উপভাষার টানে ও সুরে অসমিয়াতে কথা বলে, 'দেশ' সব সময়ই তার কাছে ধুবুড়ির কোনো গ্রাম; আবার জ্যোতিপ্রসাদের 'তুরে মুরে আলো করে...' গানের সঙ্গে তার ও তার ছেলে-মেয়েদের সহবাস। এ-ভাবেই রশিদুলের সঙ্গে সঙ্গে লেখকও ডায়াস্পোরিক ভাবনাসূত্রে বাঁধা পড়েন। নারায়ণ সরকারের গল্পে হারান-আদরিণী-ইরিনা-রঞ্জিত প্রভৃতি চরিত্রের অসমিয়া ভাষার ব্যবহার এবং বাঙালি-বোড়ো বৈবাহিক সম্পর্কের কথা আছে। এই গল্পের মাতৃ চরিত্র বিমলাদেবী 'সমস্ত বন্ধন ভেঙে চুরমার করে নতুন পথ দেখাচ্ছেন।'

আমরা এখানেই অসমের সাম্প্রতিক বাংলা গল্প পরিক্রমা শেষ করব। অসমে বহিরাগত বাঙালি জাতিসত্তার সংকটের ছবি গল্পগুলোতে যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি শিকড় ছেঁড়া মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথাও আছে। আর আছে এখানকার ইনার ডায়াস্পোরিক বাঙালির নতুন অভিব্যক্তির প্রকাশ। এতদঞ্চলের বাস্তব ছাড়া গল্পগুলো লেখা সম্ভব হত না। এর সন্ত্রাসের ছবি, এর জাতিদাঙ্গার স্বরূপ, এখানকার মানুষের স্বার্থচিন্তা বা উদ্বাস্তু সমস্যার নানা রূপ একান্তভাবেই এই ভূমিসংলগ্ন। দেশ-কালের সমস্যায় আচ্ছন্ন এই গল্পগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েও বৃহত্তর সমাজভাবনায় ঋদ্ধ। সুতরাং যে দেশ এখন সন্ত্রাসের কালো ছায়ায় ঢাকা, যে কাল বারে বারে তুলে ধরছে নির্মাণবায়নের ছবি, সেখানে বাঙালির সমস্যা, তার সংকট ও সমবায়ী চেতনা এক নতুন সম্ভাবনাকে নিয়ে আসে আগ্রহী পাঠকের কাছে। সে হয়ে ওঠে এই মাটিরই অশান্ত সময়ের দলিল।

উল্লেখসূত্র

১। তামুলী, লক্ষ্মীনাথ—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামত অসমর অবদান, (২য় সং) ১৯৯৭, রূপহী প্রকাশন, পৃ. ৯১।

২। বরা, বলিনারায়ণ—'অসমীয়া আরু বঙালি', মৌ (২য় সংখ্যা ঃ ১৮৮৭), সম্পা. ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, অসম প্রকাশন পরিষদ, ২০০৩, পৃ. ৪৪।

সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিন—

গ্রন্থ—

১। কর, দীপঙ্কর—'খোলসকথা', নাইনথ্ কলাপ প্রকাশ, গুয়াহাটি, ১২, ২০০২।

২। ঘোষ, বিজিত (সম্পা.)—'দাঙ্গার গল্প দাঙ্গার বিরুদ্ধে', পুনশ্চ প্রকাশন, কলকাতা- ১০, ২০০৯।

৩। তালুকদার, পরিতোষ—'শরীরী উপত্যকা', সাময়িক অসম প্রকাশ, গুয়াহাটি-১১, ২০০৯।

৪। দেব, দেবব্রত—'মুখাবয়বঃ অসীমান্তিক বাংলা গল্প-১', আগরতলা, ২০০৯।

৫। দেব, দেবব্রত—'মুখাবয়বঃ বাহির বাংলার গল্প-১', (প্রকাশকাল অনুল্লিখিত), আগরতলা।

Scanned with OKEN Scanner

৬। ভট্টাচার্য, তপোধীর—'ছোটগল্পের বিনির্মাণ', আবহমান (ত্রিপুরা) প্রকাশ, ২০০২।
৭। রায় ও দেবচৌধুরী, বিকাশ ও অমিতাভ (সম্পা.)—'বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার', উবুদশ, কল-১২, ২০০৮।
৮। সরকার, নারায়ণ চন্দ্র—'নির্বাচিত গল্প', ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি-৫, ২০০৯।

পত্র-পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিন

১। একা এবং কয়েকজন (গুয়াহাটি), বর্ষ ২০০০/২০০৫/২০০৬/২০০৮।
২। গল্পবিশ্ব (শিলিগুড়ি), বর্ষ ২০০২।
৩। দিক ও দিগর (বঙাইগাও), বর্ষ ২০০১/২০০৩।
৪। নবপর্যায় সম্ভার (শিলচর), বর্ষ ২০০৭।
৫। পরম্পরা (শিলচর), বর্ষ ২০০৭/২০০৮।
৬। পূর্বদেশ গল্পপত্র (গুয়াহাটি), বর্ষ ২০০১/২০০২/২০০৮।
৭। ব্যতিক্রম (গুয়াহাটি) ১ম বর্ষ, ষষ্ঠ ও দ্বাদশসংখ্যা, ২০০৯।
৮। লালনমঞ্চ (করিমগঞ্জ) বর্ষ ২০০৫।
৯। সপ্তবার্তা (বঙাইগাও), বর্ষ ২০০৭।
১০। সংলাপ (গুয়াহাটি) ২০০৮/২০০৯।
১১। সাগ্নিক (বাসুগাঁও) বর্ষ ২০০৫।
১২। সাগ্নিক (কলকাতা) 'অসমের বাংলা ছোটগল্প', '০৭।
১৩। সাহিত্য (হাইলাকান্দি), বর্ষ ২০০৪/০৬/০৮/১০।
১৪। হাওয়া ৪৯ (কলকাতা), ২৮ সং বর্ষ ২০০৩।

Jyotirmoy Sengupta,
sgiyoti1@yahoo.co.in

Scanned with OKEN Scanner